

নাম: মো: আসাদুল হক বাবু

জন্ম তারিখ: ১ মার্চ, ১৯৯৩

শহীদ হওয়ার তারিখ: ৫ আগস্ট, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা: অটোরিকশা চালক,

শাহাদাতের স্থান : যাত্রাবাড়ী ফ্লাই ওভার এর নিচে, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

শহীদের জীবনী

“বিজয় মিছিল থেকে

ফিরে আসা হলো না

শহীদ আসাদুলের”

শহীদ মো: আসাদুল হক বাবু উত্তরের জেলা দিনাজপুরের বিরল উপজেলার ভান্ডারা ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দিনাজপুরের ভারত সীমান্তবর্তী উপজেলা বিরলের অজপাড়াগাঁ রামচন্দ্রপুর। গ্রামটির উত্তরে মুন্সিপাড়া, দক্ষিণে গোপালপুর আর দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে বিরল-রাধিকাপুর করিডোর। এই গ্রামেরই মো: জয়নাল আবেদীন ও আলোয়া বেগম দম্পতির কোল জুড়ে ১৯৯৩ সালের ১ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন শহীদ আসাদুল হক। পিতা-মাতার আদরের ছোট সন্তান আসাদুল হক, তাই আদর করে সবাই ডাকতেন 'বাবু' নামে।

শহীদ বাবুর বড় দুই সহোদর বোন হলেন লাকী ও সুমি আক্তার। রামচন্দ্রপুর গ্রামেই শহীদ বাবুর লেখাপড়ার হাতেখড়ি আর কেটেছে দুরন্ত শৈশব। হতদরিদ্র পরিবারের সন্তান শহীদ বাবু। বাবার ছিল না কোন পৈত্রিক সম্পত্তি। তাই একটা বাবুর ছেলেবেলাতেই তাদের পুরো পরিবার জীবিকার তাগিদে চলে আসে রাজধানী ঢাকায়। ঢাকায় এসে শহীদ বাবুর পিতা মো: জয়নাল আবেদীন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে তিলেতিলে গড়ে তুলতে থাকেন তাঁদের সংসার। যখন যে কাজ পেয়েছেন, তাই করেছেন পরিবারের জন্য। এত কষ্টের মাঝেও বড় করে তুলেছেন নিজের আদরের সন্তান গুলোকে। বড় হয়ে বাবার পাশাপাশি শহীদ আসাদুল হক বাবুও হাল ধরেছিলেন এই পরিবারের। তবে হঠাৎ এমন ঝড় যেন এলোমেলো করে দিলো তাঁদের সবকিছু।

স্বৈরাচারের বিদায় পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত ঘটনাক্রম

মূলত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সূত্রপাত ছিল সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়কে কেন্দ্র করে, যেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য ৩০% চাকরির কোটা পুনর্বহাল করা হয়। এর আগে ২০১৮ সালে কোটা সংস্কার আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এই কোটা সংস্কার করা হয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত জনসাধারণ বিশেষ করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি করে, কারণ কোটা পদ্ধতি মেধার ভিত্তিতে চাকরিতে সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে ছিল বড় বাধা।

সরকারের অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা, মুদ্রাস্ফীতি, বিভিন্ন নিয়োগে স্বজনপ্রীতি, সরকারি অধিকাংশ প্রকল্পে দুর্নীতি, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, দিনে-দুপুরে দেশের সকল নির্বাচন গুলোতে কারচুপিতে তখন জনগন অতিষ্ঠ। তাই প্রথমে কোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শুরু হওয়া আন্দোলন দ্রুত দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

এদিকে আন্দোলন দমাতে মরিয়া হয়ে পড়ে স্বৈরাচারী হাসিনা। আন্দোলন বন্ধ করতে একপর্যায়ে খুনী হাসিনা দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয় এবং সারাদেশে পুলিশের পাশাপাশি র‌‌‌য়াব ও বিজিবি মোতায়েন করে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের মন্ত্রী, সাংসদ ও দলের শীর্ষ নেতারা ওদের অঙ্গসংগঠনগুলো বিশেষ করে ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগকে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রভাবিত করতে থাকে। ১৫ জুলাই পরবর্তী সময়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় নিরীহ শিক্ষার্থীদের ওপর নৃশংস হামলা চালায় আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী অঙ্গসংগঠন গুলো। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে সরকার সারা দেশে গুলি করে হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে কারফিউ জারি করে এবং ইন্টারনেট ও মোবাইল যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। যা কার্যকরভাবে বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শতশত সাধারণ মানুষ আর শিক্ষার্থী হত্যার খবর আসতে থাকে। বাড়তে থাকে আন্দোলনের মাত্রাও। শুধু মাত্র ৪ আগস্টের সংঘাতেই ঢাকা সহ দেশের অন্তত ২১ জেলায় ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। গণমাধ্যমের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী সেদিন সহিংসতায় ৯০ জনেরও অধিক মানুষ নিহত হয়েছিলো। পরবর্তীতে সরকার দেশজুড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করে। স্বৈরাচারী হাসিনার সরকারের পদত্যাগ ও নিরীহ ছাত্র-জনতার হত্যার বিচারের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে ৫ আগস্ট 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এই কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে দেশের সকল প্রান্ত থেকে সাধারণ ছাত্র-জনতা ঢাকা অভিমুখে লংমার্চে অংশ নেয়। কারফিউ ভেঙে করা এই লংমার্চ দমাতে মরিয়া হয়ে ওঠে দেশের সকল সামরিক বাহিনী। শুরুতে তারা ব্যাপক পেশিগত প্রদর্শন করে, ফলশ্রুতিতে বাড়তে থাকে হতাহতের সংখ্যা। তবে জনতা দাবীতে ছিলো অনড়, জনতার এই দাবী আর গণজোয়ারের কারণে বিভিন্ন জায়গায় এবার আত্মসমর্পণ করতে থাকে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা। অবস্থা বেগতিক দেখে তড়িঘড়ি করে শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন। পরবর্তীতে হাসিনা ও তার বোন শেখ রেহানা একটি সামরিক হেলিকপ্টারে প্রতীবেশী দেশ ভারতের আগরতলায় পালিয়ে যায়। শেষ হয় প্রায় দেড় যুগের একনায়কতন্ত্র আর ফ্যাসিবাদ।

বিজয়ের পরেও ছিল দুঃস্বপ্নের অধ্যায়

বেলা ১ টার কিছুক্ষণ পর থেকেই রাজধানী জুড়ে হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তবে তখনও কোন নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র পাওয়া যাচ্ছিলো না। প্রতিদিনের মতো 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচিতেও অংশগ্রহণ করেন আসাদুল হক বাবু। সেদিন হাজারো জনতার স্রোত নেমে আসে যাত্রাবাড়ীর রাস্তায়, মিছিল এগোতে থাকে শাহবাগের দিকে। মিছিলটি যাত্রাবাড়ী থানার সামনে পৌঁছালে শুরু হয় লোমহর্ষক এক অধ্যায়। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে মিছিলে। কারণ বিগত কয়েকদিনে যাত্রাবাড়ী এলাকায় নৃশংসভাবে সাধারণ মানুষ হত্যা করেছে যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ। উত্তেজিত জনতার মধ্যে কয়েকজন ক্ষোভে যাত্রাবাড়ী থানার সামনে মূল ফটকের সামনে রাখা কয়েকটি গাড়িতে আগুন দেয় এবং পুলিশের শাস্তি দাবী করে স্লোগান দিতে থাকে। মিছিলের আকার আর ছাত্র-জনতার ক্ষোভ আঁচ করতে পেরে এবার অতর্কিত হামলা চালায় যাত্রাবাড়ী থানার পুলিশ সদস্যরা। কারণ পুলিশ সদস্যরা জানতো স্বৈরাচারের ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করতে তারা

সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করেছে। যাত্রাবাড়ি থানা এলাকায় দুই থেকে তিন শতাধিক পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্র থেকে এলোপাতাড়ি গুলি করতে করতে থানার সামনে আসে। ততক্ষণে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে মিছিল। পুলিশ সেখানেই ক্ষান্ত হতে পারতো, তবে তারা এবার পূর্বের মতোই বর্বরতা চালাতে দেরি করলো না। যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারের পিলার গুলোর নিচে তখন অসংখ্য ছাত্র-জনতা প্রাণভয়ে লুকিয়ে আছে। নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার অবস্থান টের পেয়ে সেখানে নির্বিচারে গুলি চালাতে লাগলো অতি উৎসাহী পুলিশ সদস্যরা। মুহূর্তেই জনতার তাজা রক্তে ভাসলো যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারের নিচের রাস্তা। আশপাশের ভবন গুলো থেকে মানুষের আহাজারিতে ভারী হয়ে উঠলো আকাশ-বাতাস। ভবন গুলো থেকে মানুষ পুলিশের হত্যাযজ্ঞ থামানোর জন্য কাকুতি-মিনতি করতে থাকলো। তবে থামলো না পুলিশ, আরও বেপরোয়া হয়ে গুলি করতে লাগলো আশেপাশে লুকিয়ে থাকা নিরস্ত্র মানুষের ওপর। বাদ গেল না বৃদ্ধ, নারী কিংবা শিশু। হিংস্র হায়নারূপী ঘাতক পুলিশ যাকে সামনে পাচ্ছিলো তাকেই গুলি করছিলো। ফ্লাইওভারের পেছনে লুকিয়ে ছিলো আসাদুল হক বাবুও। পুলিশের গুলির সামনে আত্মসমর্পণ করার পরেও ছাড় পেল না তাঁরা। গুলি করা হলো তাঁদের দিকে। একে একে ঘাতকের চারটি গুলি এসে লাগলো আসাদুলের বুক বরাবর, ডান হাতে আর পায়ে। ঘটনাস্থলেই শাহাদাতের সুধা পান করলেন আসাদুল বাবু সহ লুকিয়ে থাকা সব নিরীহ মানুষ গুলো। যাত্রাবাড়ী থানার সামনের একটি বহুতল ভবন থেকে করা ভিডিও চিত্রে ফুটে ওঠে এইসব নৃশংসতার চিত্র। ৫ মিনিট ২৪ সেকেন্ডের ওই ভিডিও চিত্রে স্পষ্টভাবেই দেখা যাচ্ছিলো কিভাবে সেদিন ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যার সাক্ষী হলো যাত্রাবাড়ী এলাকা।

অজ্ঞাত থেকে পরিচয় মিললো শহীদ আসাদুলের

শহীদ আসাদুলের সাথে যাঁরা ঘটনাস্থলেই শাহাদাত বরণ করলেন, তাঁদের পরবর্তী গন্তব্য হলো ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগ আর মর্গ। সেদিন ঢাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে লাশ আসতে লাগলো ঢাকা মেডিকলে। এদিকে শহীদ আসাদুলের কোন খবর না পেয়ে দিশেহারা তাঁর পরিবার। বিকাল ৪টায় একটি অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন আসলো আসাদুলের বড় বোন লাকীর নিকট। ফোনের অপর পাশের ব্যক্তি আসাদুলের মারা যাওয়ার খবর গোপন করে জানালেন যে, তিনি যাত্রাবাড়ী থানার সামনে আহত অবস্থায় পড়ে থাকা আসাদুলের ফোন থেকে নম্বরটি পেয়েছেন। তারপর তিনি আসাদুলের বোনের থেকে তাঁর সম্পর্কে জানার পর বললেন, "আপনার ভাইকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালের দিকে নেওয়া হয়েছে। আপনারা আশেপাশের হাসপাতাল গুলোতে খোঁজ নিন। আমি এর বেশি কিছু জানি না।" আসাদুলের বড় বোন, তার স্বামী শাহিদ আর কিছু নিকটাত্মীয় মিলে প্রথমে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, তারপর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে খোঁজার পর আসাদুলকে খুঁজে পেলেন। তবে পেলেন না আহত কোন আসাদুলকে বরং পেলেন শহীদ আসাদুলকে। আসাদুলের আত্মীয় স্বজনের মাঝে কান্নার রোল পড়ে গেল। আসাদুলের আড়াই বছর বয়সী ফুটফুটে জমজ দুই কন্যা শুধু অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ওদের বাবার দিকে। বাবাহারা ছোট্ট দুই মেয়ের এমন নিরব চাহনি দেখে সেদিন চোখের পানি ধরে রাখার সাধ্য ছিল না কারও। শুধু আসাদুল নয় সেদিন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আরও অসংখ্য অজ্ঞাত মানুষের লাশের সারি ছিল।

হাসপাতালের ভয়াবহ সে চিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে আসাদুলের বড় বোন জামাই জিবরান শাহিদ বলেন, "সেদিনের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বর্ণনা দেওয়ার মতো সাধ্য আমার নেই। আমি বলে বোঝাতে পারবো না সে ভয়ানক দিনের কথা। স্ট্রোচার আর মেঝেতে স্তম্ভ করে রাখা শত-শত লাশ। জরুরি বিভাগে কোন ডাক্তার, নার্স কেউ ছিলো না। লাশ গুলো চেনারও কোন উপায় ছিল না। নিখোঁজ ব্যক্তিদের স্বজনেরা এসে নিজেরাই লাশের স্তম্ভ সরিয়ে স্বজনকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলেন। আমরাও লাশের স্তম্ভের মাঝে আসাদুলের নিখর দেহ খুঁজে পেলাম।"

শহীদের মর্যাদা দিয়েছিলো আপামর জনতা

শহীদ আসাদুলের নিখর দেহ নিয়ে বাইরে চলে আসার পর তাঁর স্বজনদের সান্ত্বনা দিতে লাগলো সাধারণ ছাত্র-জনতা। ছাত্ররাই শহীদের লাশ নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্স ঠিক করলো এবং নিজেরাই ভাড়া পরিশোধ করে দিতে চাইলো। তবে ভাড়া নিতে অস্বীকৃতি জানালেন অ্যাম্বুলেন্স চালক। একজন শহীদের লাশ নিয়ে যাওয়ার বিনিময়ে ভাড়া নিতে অপারগতা প্রকাশ করলেন তিনিও। বিস্মিত চোখে শহীদের প্রতি শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ দেখছিলেন শহীদ আসাদুলের পরিবারের সদস্যবৃন্দ। অতঃপর সযত্নে শহীদ আসাদুলের লাশ গাড়ীতে তুলে দিলো ছাত্ররা নিজেরাই রাস্তায় মানুষের ভীড় সরিয়ে হেঁটে হেঁটে সুদূর যাত্রাবাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলো শহীদ আসাদুলকে বহন করা অ্যাম্বুলেন্সটিকে। পরবর্তীতে সেখান থেকে পরিবারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আসাদুলকে নিয়ে যাওয়া হলো তাঁর নিজ জন্মভূমিতে। পরদিন গোসল-জানজা শেষে গ্রামের কবরস্থানেই চিরনিদ্রায় শায়িত করা হলো শহীদ আসাদুল হক বাবুকে।

শহীদ পরিবারের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ আসাদুল হক বাবুদের বেঁচে থাকার লড়াইটা বেশ পুরনো। দারিদ্র্যতার কারণেই শৈশবে পরিবারের সাথে এসেছিলেন ঢাকায়। তাঁর বাবা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিবারটিকে আগলে রেখেছিলো। একটু বড় হতেই বাবার কষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন আসাদুল, তখন থেকেই নানা রকম কাজ করে পরিবারকে সহযোগিতা করতেন তিনি। একে একে বড় দুই বোনকে বিয়ে দেওয়ার পর, নিজেও বিয়ে করেন আসাদুল। বাবা-মায়ের পাশাপাশি স্ত্রী আর ফুটফুটে জমজ দুই কন্যা সন্তানের একটু ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য সবসময়ই সর্বোচ্চ রকমের পরিশ্রম করতেন তিনি। মাস কয়েক আগেও আসাদুল যাত্রাবাড়ীর ঢালাই শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন, তবে একপর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হলে চাকুরী হারান তিনি। তাই দুই সন্তানের জনক আসাদুল নিরুপায় হয়ে ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা চালানো শুরু করেন ঢাকার রাস্তায়। এদিকে নতুন অতিথি আসার সময় ঘনিয়ে আসছিলো, আসাদুলের স্ত্রী ছিলেন সন্তান সন্তবা। একদিকে অটো চালিয়ে সংসারের ভরণপোষণ, অন্যদিকে নতুন চাকরির খোঁজ এমনই উৎকণ্ঠায় কাটছিলো আসাদুলের দিন। তবে সব উৎকণ্ঠার অবসান হলো তাঁর শাহাদাতের মধ্যে দিয়ে। সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে দিশেহারা আসাদুলের স্ত্রী। আড়াই বছরের জমজ দুই কন্যা আর অনাগত সন্তানের ভবিষ্যত তাকে যেন অথৈ সাগরে ফেলেছে। অন্যদিকে চোখে আঁধার নেমে এসেছে আসাদুলের বৃদ্ধ পিতা-মাতারও, কারণ একমাত্র পুত্র আসাদুল যে তাঁদের ও সম্বল ছিল। সবমিলিয়ে এই শহীদ পরিবারটি এখন অসহনীয় দুর্দশায় আছে।

সহযোগিতা সংক্রান্ত এক বা একাধিক প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনা-১: শহীদের আড়াই বছর বয়সী জমজ দুই কন্যা সন্তান ও সন্তান সন্তবা স্ত্রীর জন্য জরুরি ভিত্তিতে আর্থিক সহযোগিতা করা।

প্রস্তাবনা-২: শহীদের জমজ দুই কন্যার পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করা।

প্রস্তাবনা-৩: শহীদের আসহায় বৃদ্ধ পিতামাতার জন্য কিছু আর্থিক সহযোগিতা করা। তাঁর পিতাকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া।

একনজরে শহীদের জীবনঘনিষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য

শহীদের পূর্ণনাম : মো: আসাদুল হক বাবু

জন্ম তারিখ : ১ মার্চ, ১৯৯৩

পেশা : অটোরিকশা চালক

পিতার নাম : মো: জয়নাল আবেদীন

পিতার পেশা ও বয়স : একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী, ৬০ বছর

মাতার নাম : মোসা: আলেয়া বেগম

মাতার পেশা ও বয়স : গৃহিণী, ৫০ বছর

স্ত্রীর নাম : মোছা: শারমিন আক্তার

স্ত্রীর পেশা ও বয়স : গৃহিণী, ২২ বছর

পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা : ৫ জন

সন্তানের নাম, বয়স ও সম্পর্ক : ১. নাম: খাদিজা জান্নাত আফিয়া, বয়স: আড়াই বছর, শহীদের কন্যা

: ২. নাম: আছিয়া জান্নাত আফরা, বয়স: আড়াই বছর, শহীদের কন্যা

ঘাতক : যাত্রাবাড়ী থানার পুলিশ সদস্যরা

আহত হওয়ার স্থান : যাত্রাবাড়ী ফ্লাই ওভার এর নিচে, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

আহত হওয়ার সময়কাল : ৫ই আগস্ট, আনুমানিক দুপুর ১টা বেজে ৪৫ মিনিট

নিহত হওয়ার স্থান : যাত্রাবাড়ী ফ্লাই ওভার এর নিচে, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

নিহত হওয়ার সময়কাল : ৫ আগস্ট, ২০২৪, দুপুর আনুমানিক ১টা ৫০ মিনিট

শহীদের কবরের অবস্থান : রামচন্দ্রপুর কবরস্থান, ৬নং ভান্ডারা ইউনিয়ন, বিরল, দিনাজপুর

ঠিকানা সংক্রান্ত তথ্য

বর্তমান ঠিকানা : বাসা: ৮৬/২/১০/৬ উত্তর যাত্রাবাড়ী, ৪ নম্বর গেইট, ডাকঘর: গেভারিয়া-১২০৪, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: রামচন্দ্রপুর, ইউনিয়ন: ভান্ডারা, উপজেলা: বিরল, জেলা: দিনাজপুর